প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু

১৬ই এপ্রিল

আজ জার্মানি থেকে আমার চিঠির উত্তরে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর পমারের চিঠি পেয়েছি। পমার লিখছেন—

প্রিয় প্রোফেসর শঙ্কু,

তোমার তৈরি রোবো (Robot) বা যান্ত্রিক মানুষ সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ, তাতে আমার যত না আনন্দ হয়েছে, তার চেয়েও বেশি হয়েছে বিস্ময়। তুমি লিখেছ আমার রোবো সম্পর্কে গবেষণামূলক লেখা তুমি পড়েছ, আর তা থেকে তুমি অনেক জ্ঞান লাভ করেছ। কিন্তু তোমার রোবো যদি সত্যিই তোমার বর্ণনার মতো হয়ে থাকে, তা হলে বলতেই হবে যে আমার কীর্তিকে তুমি অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছ।

আমার বয়স হয়েছে, তাই আমার পক্ষে ভারতবর্ষে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তুমি যদি একটিবার তোমার তৈরি মানুষটিকে নিয়ে আমার এদিকে আসতে পার, তা হলে আমি শুধু খুশিই হব না, আমার উপকারও হবে। এই হাইডেলবার্গেই আমারই পরিচিত আরেকটি বৈজ্ঞানিক আছেন—ডক্টর বোর্গেল্ট। তিনিও রোবো নিয়ে কিছু কাজ করেছেন। হয়তো তাঁর সঙ্গেও তোমার আলাপ করিয়ে দিতে পারব।

তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। যদি আসতে রাজি থাক, তা হলে একদিকের ভাড়াটার আমি নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে দিতে পারব। আমার এখানেই তোমার থাকার ব্যবস্থা হবে, বলাই বাহুল্য।

ইতি

রুডল্‌ফ পমার

পমারের চিঠির উত্তর আজই দিয়ে দিয়েছি। বলেছি আগামী মাসের মাঝামাঝি আসব। ভাড়ার ব্যাপারে আর আপত্তি করলাম না, কারণ জার্মানি যাতায়াতের খরচা কম নয়, অথচ ওদেশটা দেখার লোভও আছে যথেষ্ট।

আমার রোবু সঙ্গে যাবে অবশ্যই, তবে ও এখনও বাংলা আর ইংরিজি ছাড়া কিছু বলতে পারে না। এই একমাসে জার্মানটা শিখিয়ে নিলে ও সরাসরি পমারের সঙ্গে কথা বলতে পারবে ; আমাকে আর দোভাষীর কাজ করতে হবে না।

রোবুকে তৈরি করতে আমার সময় লেগেছে দেড় বছর। আমার চাকর প্রহ্লাদ সব সময় আমার পাশে থেকে জিনিসপত্র এগিয়েটেগিয়ে দিয়ে সাহায্য করেছে, কিন্তু আসল কাজটা সমস্ত আমি নিজেই করেছি। আর যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, সেটা হচ্ছে রোবুকে তৈরি করার খরচ। সবসুদ্ধ মিলিয়ে খরচ পড়েছে মাত্র তিনশো তেত্রিশ টাকা সাড়ে সাত আনা। এই সামান্য টাকায় যে জিনিসটা তৈরি হল সেটা ভবিষ্যতে হবে আমার ল্যাবরেটরির সমস্ত কাজে আমার সহকারী, যাকে বলে রাইট হ্যান্ড ম্যান। সাধারণ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের অঙ্ক কষতে রোবুর লাগে এক সেকেন্ডের কম সময়। এমন কোনও কঠিন অঙ্ক নেই যেটা করতে

ওর দশ সেকেন্ডের বেশি লাগবে। এ থেকে বোঝা যাবে আমি জলের দরে কী এক আশ্চর্য জিনিস পেয়ে গেছি। 'পেয়ে গেছি' বলছি এই জন্যে যে, কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকেই আমি সম্পূর্ণ মানুষের সৃষ্টি বলে মনে করতে পারি না। সম্ভাবনাটা আগে থেকেই থাকে, হয়তো চিরকালই ছিল; মানুষ কেবল হয় বুদ্ধির জোরে না হয় ভাগ্যবলে সেই সম্ভাবনাগুলোর হদিস পেয়ে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে নেয়।

রোবুর চেহারাটা যে খুব সুশ্রী হয়েছে তা বলতে পারি না। বিশেষ করে দুটো চোখ দুরকম হয়ে যাওয়াতে ট্যারা বলে মনে হয়। সেটাকে ব্যালান্স করার জন্য আমি রোবুর মুখে একটা হাসি দিয়ে দিয়েছি। যতই কঠিন অঙ্ক করুক না সে—হাসিটা ওর মুখে সব সময় লেগে থাকে। মুখের জায়গায় একটা ফুটো দিয়ে দিয়েছি, কথাবার্তা সব ওই ফুটো দিয়ে বেরোয়। ঠোঁট নাড়ার ব্যাপারটা করতে গেলে অযথা সময় আর খরচ বেড়ে যেত তাই ওদিকে আর যাইনি।

মানুষের যেখানে ব্রেন থাকে, সেখানে রোবুর আছে একগাদা ইলেক্ট্রিক তার, ব্যাটারি, ভ্যাল্‌ভ ইত্যাদি। কাজেই ব্রেন যা কাজ করে, তার অনেকগুলোই রোবু পারে না। যেমন সুখ দুঃখ অনুভব করা, বা কারুর ওপর রাগ করা বা হিংসে করা—এসব রোবু জানেই না। ও কেবল কাজ করে আর প্রশ্নের উত্তর দেয়। অঙ্ক সব রকমই পারে, তবে শেখানো কাজের বাইরে কাজ করে না, আর শেখানো প্রশ্নের জবাব ছাড়া কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। পঞ্চাশ হাজার ইংরিজি আর বাংলা প্রশ্নের উত্তর ওকে শিখিয়েছি—একদিনও ভুল করেনি। এবার হাজার দশেক জার্মান প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দিলেই আমি জার্মানি যাবার জন্য তৈরি হয়ে যাব।

এত অভাব থেকে রোবু যা করে তা পৃথিবীর আর কোনও যান্ত্রিক মানুষ করেছে বলে মনে হয় না। এমন একটা জিনিস সৃষ্টি করে গিরিডি শহরের মধ্যে সেটাকে বন্দি করে রাখার কি কোনও মানে হয়? বাংলাদেশে সামান্য রসদে বাঙালি বৈজ্ঞানিক কী করতে পারে, সেটা কি বাইরের জগতের জানা উচিত নয়? এতে নিজের প্রচারের চেয়ে দেশের প্রচার বেশি। অন্তত আমার উদ্দেশ্য সেটাই।

১৮ই এপ্রিল

অ্যাদ্দিনে অবিনাশবাবু আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা স্বীকার করলেন। আমার এই প্রতিবেশীটি ভাল মানুষ হলেও, আমার কাজ নিয়ে তাঁর ঠাট্টার ব্যাপারটা মাঝে মাঝে বরদাস্ত করা মুশকিল হয়।

উনি প্রায়ই আমার সঙ্গে আড্ডা মারতে আসেন—কিন্তু গত তিনমাসের মধ্যে যতবারই এসেছেন, ততবারই আমি প্রহ্লাদকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছি যে আমি ব্যস্ত, দেখা হবে না।

আজ রোবুকে জার্মান শিখিয়ে আমার ল্যাবরেটরির চেয়ারে বসে একটা বিজ্ঞান পত্রিকার পাতা উলটোচ্ছি, এমন সময় উনি এসে হাজির। আমার নিজেরও ইচ্ছে ছিল উনি একবার রোবুকে দেখেন, তাই ভদ্রলোককে বৈঠকখানায় না বসিয়ে একেবারে ল্যাবরেটরিতে ডেকে পাঠালাম।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই নাক সিঁটকিয়ে বললেন, 'আপনি কি হিং-এর কারবার ধরেছেন নাকি?' পরমুহূর্তেই রোবুর দিকে চোখ পড়তে নিজের চোখ গোল গোল করে বললেন, 'ওরে বাস্—ওটা কী? ওকি রেডিও, না কলের গান, না কী মশাই?'

অবিনাশবাবু এখনও গ্রামোফোনকে বলেন কলের গান, সিনেমাকে বলেন বায়স্কোপ,

http://boiRboi.blogspot.com/

এরোপ্লেনকে বলেন উড়োজাহাজ।

আমি ওঁর প্রশ্নের উত্তরে বললাম, 'ওকেই জিজ্ঞেস করুন না ওটা কী। ওর নাম রোবু।'

'রোবুস্কোপ?'

'রোবুস্কোপ কেন হতে যাবে? বলছি না ওর নাম রোবু! আপনি ওর নাম ধরে জিজ্ঞেস করুন ওটা কী জিনিস, ও ঠিক জবাব দেবে।'

অবিনাশবাবু 'কী জানি বাবা এ আপনার কী খেলা' বলে যন্ত্রটার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি কী হে রোবু?'

রোবুর মুখের গর্ত থেকে পরিষ্কার উত্তর এল, 'আমি যান্ত্রিক মানুষ। প্রোফেসর শঙ্কুর সহকারী।'

ভদ্রলোকের প্রায় ভিরমি লাগার জোগাড় আর কী। রোবু কী কী করতে পারে শুনে, আর তার কিছু কিছু নমুনা দেখে অবিনাশবাবু একেবারে ফ্যাকাশে মুখ করে আমার হাত দুটো ধরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। বুঝলাম এবার তিনি সত্যিই ইম্‌প্রেস্‌ড।

আজ একটা পুরনো জার্মান বিজ্ঞানপত্রিকায় প্রোফেসর বোর্গেল্টের লেখা রোবো সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ হঠাৎ চোখে পড়ে গেল। উনি বেশ দেমাকি মেজাজেই লিখেছেন যে, যান্ত্রিক মানুষ তৈরির ব্যাপারে জার্মানরা যা কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তেমন আর কোনও দেশে কেউ দেখায়নি। তিনি আরও লিখেছেন যে, যান্ত্রিক মানুষকে দিয়ে চাকরবাকরের মতো কাজ করানো সম্ভব হলেও, তাকে দিয়ে কাজের কাজ বা বুদ্ধির কাজ কোনওদিনই করানো যাবে না।

প্রোফেসর বোর্গেল্টের একটা ছবিও প্রবন্ধটার সঙ্গে রয়েছে। প্রশস্ত ললাট, ভুরু দুটো অস্বাভাবিক রকম ঘন, চোখ দুটো কোটরে ঢোকা, আর থুতনির মাঝখানে একটা দু ইঞ্চি আন্দাজ লম্বা আর সেই রকমই চওড়া প্রায় চারকোনা কালো দাড়ির চাবড়া।

ভদ্রলোকের লেখা পড়ে আর তাঁর চেহারা দেখে তাঁর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহটা আরও বেড়ে গেল।

২৩শে মে

আজ সকালে হাইডেলবার্গ পৌঁছেছি। ছবির মতো সুন্দর শহর, ইউরোপের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থিতির জন্য প্রসিদ্ধ। নেকার নদী শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে, পেছনে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে সবুজ বনে ঢাকা পাহাড়। এই পাহাড়ের উপর রয়েছে হাইডেলবার্গের ঐতিহাসিক কেল্লা।

শহর থেকে পাঁচ মাইল বাইরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রোফেসর পমারের বাসস্থান। সত্তর বছরের বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক আমাকে যে কী খাতির করলেন তা বলে বোঝানো যায় না। বললেন, 'ভারতবর্ষের প্রতি জার্মানির একটা স্বাভাবিক টান আছে জান বোধ হয়। আমি তোমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য দর্শন ইত্যাদির অনেক বই পড়েছি। ম্যাক্স মূলার এসব বইয়ের চমৎকার অনুবাদ করেছেন। তাঁর কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী। তুমি একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক হয়ে আজ যে কাজ করেছ, তাতে আমাদের দেশেরও গৌরব বাড়ল।'

রোবুকে তার সাইজ অনুযায়ী একটা প্যাকিংকেসে খড়, তুলো, করাতের গুঁড়ো ইত্যাদির মধ্যে খুব সাবধানে শুইয়ে নিয়ে এসেছিলাম। পমারের তাকে দেখার জন্য খুবই কৌতূহল হচ্ছে জেনে আমি দুপুরের মধ্যেই তাকে বাক্স থেকে বার করে ঝেড়ে পুঁছে পমারের

ল্যাবরেটরিতে দাঁড় করালাম। পমার এ জিনিসটি নিয়ে এত গবেষণা এত লেখালেখি করলেও নিজে কোনওদিন রোবো তৈরি করেননি।

রোবুর চেহারা দেখে তাঁর চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন, 'এ যে তুমি দেখছি আঠা, পেরেক, আর স্টিকিং প্লাস্টার দিয়েই সব জোড়ার কাজ সেরেছ! তুমি বলছ এই রোবো কথা বলে, কাজ করে?'

পমারের গলায় অবিশ্বাসের সুর অতি স্পষ্ট।

আমি একটু হেসে বললাম, 'আপনি ওকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ওকে প্রশ্ন করুন না।'

পমার রোবুর দিকে ফিরে বললেন, 'Welche arbeit machst du? (তুমি কী কাজ কর?)'

রোবু স্পষ্ট গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে উত্তর দিল, 'Ich helfe meinem herrn bei seiner arbeit, und lose mathematische probleme (আমি আমার মনিবের কাজে সাহায্য করি, আর অঙ্কের সমস্যার সমাধান করি)।'

পমার রোবুর দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে কিছুক্ষণ মাথা নাড়লেন। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'শঙ্কু, তুমি যা করেছ, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার কোনও তুলনা নেই। বোর্গেল্টের ঈর্ষা হবে।'

এর আগে বোর্গেল্ট সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনও কথা হয়নি। হঠাৎ পমারের মুখে তাঁর নাম শুনে একটু চমকেই গেলাম। বোর্গেল্টও কি নিজে কোনও রোবো তৈরি করেছেন নাকি?

আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই পমার বললেন, 'বোর্গেল্ট হাইডেলবার্গেই আছে—আমারই মতো নির্জন পরিবেশে, তবে নদীর ওপারে। আমার সঙ্গে আগে যথেষ্ট আলাপ ছিল—বন্ধুত্বই বলতে পারো। একই স্কুলে পড়েছি বার্লিনে—তবে ওর চেয়ে আমি তিন বছরের সিনিয়র ছিলাম। তারপর আমি হাইডেলবার্গে এসে ডিগ্রী পড়ি। ও বার্লিনেই থেকে যায়। বছর দশেক হল ও এখানে এসে ওদের পৈতৃক বাড়িতে রয়েছে।'

'উনি কি নিজে রোবো তৈরি করেছেন?'

'অনেকদিন থেকেই লেগে আছে—কিন্তু বোধ হয় সফল হয়নি। মাঝে তো শুনেছিলাম ওর মাথাটা একটু বিগড়েই গেছে। গত ছ'মাস ও বাড়ি থেকে বেরোয়নি। আমি টেলিফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছি কয়েকবার, প্রতিবারই ওর চাকর বলেছে বোর্গেল্ট অসুস্থ। ইদানীং আর ফোনটোন করিনি।'

'আমি এসেছি সেটা কি উনি জানেন?'

'তা তো বলতে পারি না। তুমি আসছ সেকথা এখানকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে আমি বলেছি—তাদের সঙ্গে তোমার দেখাই হবে। খবরের কাগজের লোকও কেউ কেউ জেনে থাকতে পারে। বোর্গেল্টকে আর আলাদা করে জানাবার প্রয়োজন দেখিনি।'

আমি চুপ করে রইলাম। দেয়ালে একটা কুকু ক্লকে কুক কুক করে চারটে বাজল। খোলা জানালার বাইরে বাগান দেখা যাচ্ছে; তারও পিছনে পাহাড়। দু-একটা পাখির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

পমার বললেন, 'রাশিয়ার স্ট্রেগোনাফ, আমেরিকার প্রোফেসর স্টাইনওয়ে, ইংলন্ডের ডাঃ ম্যানিংস—এঁরা সকলেই রোবো তৈরি করেছেন। জার্মানিতেও তিন-চারটে রোবো তৈরি হয়েছে—আর সেগুলো সবই আমি দেখেছি। কিন্তু তাদের কোনওটাই এত সহজে তৈরি হয়নি, আর এমন স্পষ্ট কথাও বলতে পারে না।'

আমি বললাম, 'ও কিন্তু অঙ্কও করতে পারে। ওকে যে কোনও অঙ্ক দিয়ে আপনি পরীক্ষা

করে দেখতে পারেন।'

পমার অবাক হয়ে বললেন, 'বলো কী ! ও আউয়েরবাখের ইকুয়েশন জানে ?'

'জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

রোবুকে পরীক্ষা করে পমার বললেন, 'এ একেবারে তাজ্জব কাণ্ড। সাবাস তোমার প্রতিভা।' তারপর একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার রোবু কি মানুষের মতো অনুভব করতে পারে ?'

আমি বললাম, 'না—ও জিনিসটা ও পারে না।'

পমার বললেন, 'আর কিছু না হোক, তোমার ব্রেনের সঙ্গে ওর যদি একটা সংযোগ থাকত তা হলে খুব ভাল হত। অন্তত তোমার সুখ দুঃখ যদি ও বুঝতে পারত তা হলে ওকে দিয়ে তোমার অনেক উপকার হতে পারত। ও সত্যিই তা হলে তোমার একজন নির্ভরযোগ্য সাথী হতে পারত।'

পমার যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, 'আমি ওই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি—একটা যান্ত্রিক মানুষকে কী করে একটা রক্ত-মাংসের মানুষের মনের কথা বোঝানো যায়। এ নিয়ে অনেক দূর আমি এগিয়েও ছিলাম, কিন্তু তারপর বুড়ো হয়ে পড়লাম। ব্রেনটা ঠিকই ছিল, কিন্তু হৃদরোগ ধরে কাবু করে দিল। আর, যে রোবোর উপর এইসব পরীক্ষা চালাব, সেটা তৈরি করারও আমার সামর্থ্য রইল না।'

আমি বললাম, 'আমি রোবুর কাজে দিব্যি খুশি আছি। ও যতটুকু করে তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

পমার কিছু বললেন না। তিনি দেখি একদৃষ্টে রোবুর দিকে চেয়ে আছেন। রোবুর মুখে সেই হাসি। ঘরের জানালা দিয়ে পড়ন্ত রোদ ঢুকে রোবুর বাঁ চোখটার উপর পড়েছে। রোদের ঝলসানিতে ইলেক্‌ট্রিকের বাল্‌বের চোখও মনে হয় হাসছে।

২৪শে মে

এখন রাত বারোটা। আমি পমারের বাড়ির দোতলার ঘরে বসে আমার ডায়রি লিখছি। গতকাল মাঝরাত্তির থেকে আরম্ভ করে আজ সারাদিনের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে, যেগুলো সব গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করছি। কতদূর পারব তা জানি না, কারণ আমার মন ভাল নেই। জীবনে আজ প্রথম আমার মনে সন্দেহ জেগেছে যে আমি নিজেকে যত বড় বৈজ্ঞানিক বলে মনে করেছিলাম, সত্যিই আমি তত বড় কি না। তাই যদি হতাম, তা হলে এভাবে অপদস্থ হলাম কেন ?

কাল রাত্রের ঘটনাটাই আগে বলি। এটা তেমন কিছু না, তবু লিখে রাখা ভাল।

রাত্রে পমার আর আমি ডিনার শেষ করে উঠেছি ন'টায়। তারপর দুজনে বৈঠকখানায় বসে কফি খেতে খেতে অনেক গল্প করেছি। তখনও পমারকে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে দেখেছি। কী ভাবছিলেন কে জানে। হয়তো রোবুকে দেখা অবধি ওঁর নিজের অক্ষমতার কথাটা বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে। সত্যিই, উনি যে রকম বুড়ো হয়ে গেছেন, তাতে ওঁর পক্ষে আর রোবো নিয়ে নতুন করে কোনও গবেষণা করা সম্ভব বলে মনে হয় না।

আমি শুতে গেছি দশটার কিছু পরে। যাবার আগে রোবুকে দেখে গেছি। পমারের ল্যাবরেটরিতে ও দিব্যি আরামে আছে বলেই মনে হল। জার্মানির আবহাওয়া, এখানকার শীত ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—এসবের প্রতি ওর কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। ও যেন শুধু অপেক্ষা

করে আছে আমার আদেশের জন্য। ঘুমোতে যাবার আগে আমরা দুই বৈজ্ঞানিক জার্মান ভাষায় ওর কাছে বিদায় নিলাম। রোবুও পরিষ্কার গলায় বলল, 'গুটে নাখ্ট্, হের্ প্রোফেসর শঙ্কু—গুটে নাখ্ট হের্ প্রোফেসর পমার।'

বিছানার পাশের বাতি জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ একটা ম্যাগাজিন উলটে পালটে ঢং ঢং করে নীচের সিঁড়ির গ্রান্ডফাদার ঘড়িতে এগারোটা বাজা শুনে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছি।

মাঝরাত্তিরে যখন ঘুম ভেঙেছে তখন কটা বেজেছে জানি না। ঘুমটা ভেঙেছে একটা আওয়াজ শুনেই—আর সে আওয়াজটা আসছে আমার ঘরের ঠিক নীচে পমারের ল্যাবরেটরি থেকে। খট খট খট ঠং ঠং—খট খট। একবার মনে হচ্ছে কাঠের মেঝের উপর মানুষের পায়ের আওয়াজ, আরেকবার মনে হচ্ছে যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটির শব্দ।

তবে আওয়াজটা পাঁচ মিনিটের বেশি আর শুনতে পেলাম না। তাও বেশ কিছুক্ষণ কান খাড়া করে শুয়ে রইলাম—যদি আরও কোনও শব্দ হয়। কিন্তু তারপরে ঘড়িতে তিনটে বাজার শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনিনি।

সকালে ব্রেকফাস্টের সময় পমারকে আর এ বিষয়ে কিছু বললাম না। কারণ আমার ঘুমের কোনওরকম ব্যাঘাত হয়েছে শুনে উনি হয়তো ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

ব্রেকফাস্টের পর একটু বেড়াতে যাব বলে ঠিক করেছিলাম, কিন্তু টেবিল ছেড়ে ওঠার আগেই পমারের চাকর কুর্ট এসে একটা ভিজিটিং কার্ড তার মনিবের হাতে দিল। নাম পড়ে পমার অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী, বোর্গেল্ট এসেছে দেখছি!'

আমিও খবরটা জেনে রীতিমতো অবাক হলাম।

বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি, গিরিডিতে থাকতে জার্মান পত্রিকার ছবিতে যে মুখ দেখেছিলাম, এ সে-ই মুখ, কেবল চুলে আরও অনেক বেশি পাক ধরেছে। আমরা ঢুকতেই বোর্গেল্ট সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভিবাদন জানালেন। এত বয়স সত্ত্বেও তাঁর চটপটে মিলিটারি ভাব দেখে আশ্চর্য লাগল। এঁরও তো প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স—কিন্তু কী জোয়ান স্বাস্থ্য!

পমার বললেন, 'কই, বোর্গেল্ট, তোমাকে দেখে তো লম্বা অসুখ থেকে উঠেছ বলে মোটেই বোধ হচ্ছে না—বরং মনে হচ্ছে চেঞ্জে গিয়ে শরীর সারিয়ে এসেছ।'

বোর্গেল্ট ভারী গলায় হো হো করে হেসে বললেন, 'অসুখ বললে লোকে উৎপাতটা কম করে; ব্যস্ত আছি বললে অনেক সময়েই কাজ হয় না—বরং লোকের তাতে কৌতূহলটা বেড়েই যায়, আর তখন তারা টেলিফোন করে বার বার জানতে চায় ব্যস্ততার কারণ কী। বুঝতেই পারছ সে কারণটা সব সময় বলা যায় না।'

'তা অবিশ্যি যায় না।'

পমার বোর্গেল্টকে পানীয় অফার করতে ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'ও জিনিসটা একদম ছেড়ে দিয়েছি, আর আমার সময়ও খুব বেশি নেই। আমি আজকের খবরের কাগজে রোবো সহ প্রোফেসর শঙ্কুর এখানে আসার কথা পড়লাম। ও ব্যাপারে আমার কীরকম কৌতূহল সে তো জানোই। তাই খবর না দিয়েই একেবারে সটান চলে এলাম। আশা করি কিছু মনে করনি।'

'না, না।'

আমি বললাম, 'আপনি বোধ হয় তা হলে আমার যন্ত্রটা একবার দেখতে চান।'

'সেই জন্যেই তো আসা। আপনি কীভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করলেন সেটা জানার স্বভাবতই একটা আগ্রহ হচ্ছে।'

বোর্গেল্টকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে এলাম।

রোবুকে দেখেই বোর্গেল্টের প্রথম কথা হল, 'আপনি বোধ হয় চেহারাটার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি। আমার মনে হয় এ জিনিসটাকে যান্ত্রিক মানুষ না বলে কেবল যন্ত্র বলাই ভাল—তাই নয় কি ?'

এটা অবিশ্যি আমি অস্বীকার করতে পারলাম না। বললাম, 'আমি কাজের উপরই জোরটা দিয়েছি বেশি—সেটা ঠিক। অ্যাপোলোর মতো নিখুঁত সুদর্শন মানুষ ওকে নিশ্চয়ই বলা চলে না।'

'আপনার রোবো ভাল অঙ্ক কষতে পারে শুনেছি !'

'টেস্ট করবেন ?'

বোর্গেল্ট রোবুর দিকে ফিরে বললেন, 'দুইয়ে দুইয়ে কত হয় ?'

উত্তরটা রোবুর মুখ থেকে এত জোরে এল যে পমারের ল্যাবরেটরির কাচের জিনিসপত্র সব ঝনঝন করে উঠল। এত জোরে রোবু কখনও কথা বলে না। স্পষ্ট বুঝলাম—আর বুঝে একটু অবাক হলাম যে, বোর্গেল্টের প্রশ্নে রোবু বিরক্ত হয়েছে।

বোর্গেল্টের নিজের হাবভাবও এই দাবড়ানির চোটে একটু আড়ষ্ট বলে মনে হল। তিনি একের পর এক কঠিন অঙ্কের প্রশ্ন রোবুকে করতে লাগলেন, আর রোবুও যথারীতি পাঁচ থেকে সাত সেকেন্ডের মধ্যে প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল। গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠল। বোর্গেল্টের দিকে চেয়ে দেখি এই চল্লিশ ডিগ্রি শীতের মধ্যেও তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

প্রায় পাঁচ মিনিট প্রশ্ন করার পর বোর্গেল্ট আমার দিকে ফিরে বললেন, 'অঙ্ক ছাড়া আর কী জানে ও ?'

আমি বললাম, 'আপনার বিষয়ে ওর অনেক তথ্য জানা আছে—জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

আসবার আগে একটা জার্মান বিজ্ঞানকোষ থেকে বোর্গেল্ট-এর জীবন সংক্রান্ত অনেক খবর রোবুর মধ্যে 'পুরে' দিয়েছিলাম। আমি আন্দাজ করেছিলাম যে, বোর্গেল্ট রোবুকে প্রশ্ন করতে পারেন।

বোর্গেল্ট আমার কথা শুনে যেন বেশ একটু অবাক হলেন। তারপর বললেন, 'এত জ্ঞান আপনার যন্ত্রের ? বেশ, বলো তো হের্ রোবু...আমার নামটি কী।'

রোবুর মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। এক সেকেন্ড, দু সেকেন্ড, দশ সেকেন্ড, এক মিনিট—কোনও উত্তর নেই, কোনও শব্দ নেই, কোনও কিচ্ছু নেই। রোবু যেন ঘরের আর সব টেবিল চেয়ার আলমারি যন্ত্রপাতির মতোই নিষ্প্রাণ, নির্জীব।

এবারে আমার ঘাম ছোটার পালা। আমি এগিয়ে রোবুর মাথার উপরের বোতামটা নিয়ে টেপাটেপি করলাম, এটা নাড়লাম, ওটা নাড়লাম—এমনকী রোবুর সমস্ত শরীরটাকে নিয়ে বারবার ঝাঁকুনি দিলাম—ভিতরের কলকবজা সব ঝনঝন করে উঠল— কিন্তু কোনও ফল হল না।

রোবু আজ আমার এবং ভারতীয় বিজ্ঞানের সমস্ত মানসম্মান এই দুই বিখ্যাত বিদেশি বৈজ্ঞানিকের সামনে মাটিতে মিশিয়ে দিল।

বোর্গেল্ট মুখ দিয়ে হুঁঃ করে একটা শব্দ করে বললেন, 'ওটায় যে একটা বড় রকম ডিফেক্ট রয়ে গেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যাই হোক—অঙ্কটা ও ভালই জানে। যদি অসুবিধা না হয়, কাল বিকেলে ওটাকে নিয়ে একবার আমার বাড়িতে গেলে আমি সারিয়ে দিতে পারব বলে মনে হয়। আর আমারও কিছু দেখাবার আছে। তোমাদের দুজনেরই নেমন্তন্ন রইল।'

বোর্গেল্ট বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

পমার আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন, আর আমিও বুঝতে পারছিলাম তিনি নিজেও খুব বিব্রত বোধ করছেন। বললেন, 'আমার কাছে ব্যাপারটা ভারী আশ্চর্য লাগছে। এসো তো দেখা যাক ও এখন আবার ঠিকমতো কথা বলছে কি না।'

ল্যাবরেটরিতে ফিরে গিয়ে রোবুকে প্রশ্ন করতে সে আবার যথারীতি জবাব দিতে শুরু করল। হাঁটা চলাও ঠিকই করল। বুঝতে পারলাম যে ঠিক ওই একটা প্রশ্নের মুহূর্তে ওর মধ্যে কোনও একটা সাময়িক গণ্ডগোল হয়েছিল যার জন্য বেচারা জবাবটা দিতে পারেনি। এ ব্যাপারে দায়ী করতে হলে আমাকেই করতে হয়। ওর আর কী দোষ ?

সন্ধ্যার দিকে বোর্গেল্টের কাছ থেকে টেলিফোন এল। ভদ্রলোক আগামীকালের নেমন্তন্নের কথা মনে করিয়ে দিলেন। রোবুকে নিয়ে আসার কথাটাও আবার বলে বললেন, 'আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না, কাজেই আপনার যন্ত্র যদি গণ্ডগোল করে, বাইরের কারুর কাছে অপদস্থ হবার কোনও ভয় নেই আপনার।'

মন থেকে অসোয়াস্তি যাচ্ছিল না। কাজেই রাত্রে পাছে ঘুম না হয় সেই জন্য আমার তৈরি ঘুমের ওষুধ সম্‌নোলিনের একটা বড়ি খেয়ে নিয়েছি।

একটা কথা মনে পড়ে একটু খটকা লাগল। কাল মাঝরাত্রিতে খুট খুট আওয়াজ কেন হচ্ছিল ? পমার নিজেই কি ল্যাবরেটরিতে কাজ করছিলেন নাকি ? রোবুর ভিতরের কলকবজা তিনি কিছু বিগড়ে দেননি তো ?

পমার আর বোর্গেল্টের মধ্যে কোনও ষড়যন্ত্র চলছে না তো ?

২৭শে মে

কাল দেশে ফিরব। হাইডেলবার্গের বিভীষিকা কোনওদিন মন থেকে মুছবে বলে মনে হয় না।

তবে একটা নতুন জ্ঞান লাভ করেছি এখানে এসে। এটা বুঝেছি যে, বৈজ্ঞানিকেরা সম্মানের যোগ্য হলেও, তাঁরা সকলেই বিশ্বাসের যোগ্য নন। কিন্তু যখন ঘটনাটা ঘটল, তখন এসব কথা কিছুই মনে হয়নি। তখন কেবল মনে হয়েছিল—আমার এত কাজ বাকি, কিন্তু আমি কিছুই করে যেতে পারলাম না। কীভাবে যে প্রাণটা—

ঘটনাটা খুলেই বলি।

বোর্গেল্ট আমাদের দুজনকে নেমন্তন্ন করে গিয়েছিলেন। রোবুকে সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করা সহজ নয়, কিন্তু ভদ্রলোক যখন বলেইছেন তখন ওকে নিয়ে যাওয়াই স্থির করলাম। বিকেল চারটে নাগাদ রোবুকে বাক্সে পুরে একটা ঘোড়ারগাড়ির একদিকের সিটে তাকে কাত করে শুইয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে, তার উলটো দিকের সিটে আমরা দুজন বসে বোর্গেল্টের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম। মাইল তিনেকের পথ, যেতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো লাগবে।

পথে যেতে যেতে রাস্তার দুধারে বসন্তকালীন চেরিফুলের শোভা দেখতে দেখতে পমারের কাছে বোর্গেল্টের পূর্বপুরুষদের কথা শুনলাম। তাঁদের মধ্যে একজন—নাম জুলিয়াস বোর্গেল্ট—ব্যারন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো মরা মানুষকে জ্যান্ত করতে গিয়ে নিজেই রহস্যময়ভাবে প্রাণ হারান। এ ছাড়া দু-একজন উন্মাদ পুরুষদের কথা শোনা যায় যাঁরা নাকি বেশির ভাগ জীবনই পাগলাগারদে কাটিয়েছিলেন।

বনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ে রাস্তা উঠে গেছে। এখানে ঠাণ্ডাটা যেন আরও বেশি, তা ছাড়া রোদও পড়ে আসছে। আমি মাফলারটা বেশ ভাল করে জড়িয়ে নিলাম।

কিছুক্ষণ চলার পর একটা মোড় ঘুরতেই সামনে একটা কারুকার্য করা বিরাট গেট দেখা

গেল। পমার বললেন, 'এসে গেছি।' গেটের উপর নকশা করে লেখা রয়েছে 'ভিলা মারিয়ান'।

একজন প্রহরী এসে গেটটা খুলে দিল। আমাদের গাড়ি তার ভিতর দিয়ে ঢুকে খট খট করতে করতে একেবারে বাড়ির দরজার সামনে উপস্থিত হল। বাড়ির চেয়ে প্রাসাদ বা কেল্লা বললেই বোধ হয় ভাল।

বোর্গেল্ট সামনেই অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের নামার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে তাঁর ঠাণ্ডা হাত দিয়ে আমাদের করমর্দন করে বললেন, 'তোমরা আসাতে আমি ভারী খুশি হয়েছি।'

তারপর দুজন ষণ্ডামার্কা চাকর বেরিয়ে এসে রোবুর বাক্সটা তুলে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। আমরা ভিতরে বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম, আর তার পাশেই লাইব্রেরিতে বোর্গেল্টের আদেশ মতো রোবুকে বাক্স থেকে বার করে দাঁড় করানো হল।

সমস্ত বাড়িটা, বিশেষ করে এই বৈঠকখানা এবং তার প্রত্যেকটি জিনিস—ছবি, আয়না, ঘড়ি, ঝাড়লণ্ঠন—সব কিছুতেই যেমন প্রাচীনত্ব তেমনই আভিজাত্যের ছাপ। একটা কেমন গন্ধ রয়েছে ঘরটার মধ্যে, যেটা কিছুটা পুরনো কাঠের, আর কিছুটা যেন মনে হয় কোনও ওষুধের বা কেমিক্যালের। বোর্গেল্টেরও নিজের একটা ল্যাবরেটরি নিশ্চয়ই আছে, আর সেটা হয়তো এই বৈঠকখানারই কাছাকাছি কোথাও হবে। বাতি জ্বালানো সত্ত্বেও ঘরের আবছা অন্ধকার ভাবটা কাটল না। কাটবেই বা কী করে, এমন কোনও জিনিস ঘরে নেই যার রং

বলা যেতে পারে হালকা। সবই হয় ব্রাউন না হয় কালচে—আর সবই পুরনো। সব মিলিয়ে একটা গম্ভীর গা ছম ছম করা ভাব।

আমি মদ খাই না বলে বোর্গেল্ট আমার জন্য গেলাসে করে আপেলের রস আনিয়ে দিলেন। যে চাকরটি ট্রেতে করে পানীয় নিয়ে এল, দেখলে মনে হয় তার অন্তত নব্বুই বছর বয়স হবে। আমি হয়তো তার দিকে একটু বেশি মাত্রায় অবাক হয়ে দেখছিলাম, আর বোর্গেল্ট বোধ হয় আমার কৌতূহল মেটাবার জন্যই বললেন, 'রুডি আমার জন্মের আগে থেকেই এ বাড়িতে আছে। ওরা তিনপুরুষ ধরে আমাদের বাড়ির চাকর।'

এখানে বলে রাখি, বোর্গেল্টের মতো এমন গম্ভীর অথচ এত মোলায়েম গলার স্বর আমি আর কখনও শুনিনি।

আমরা তিনজনে হাতে গেলাস তুলে পরস্পরের স্বাস্থ্য কামনা করছি, এমন সময় বাইরে কোথা থেকে যেন টেলিফোন বেজে উঠল। তারপর বুড়ো চাকর রুডি এসে খবর দিল পমারের ফোন। পমার উঠে ফোন ধরতে চলে গেলেন।

বোর্গেল্টের হাতের গেলাসেও আপেলের রস। সেটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বোর্গেল্ট বললেন, 'প্রফেসর শঙ্কু—তুমি জান বোধ হয়, আজ ত্রিশ বছর ধরে বৈজ্ঞানিকেরা যান্ত্রিক মানুষ নিয়ে গবেষণা করছেন।'

আমি বললাম, 'জানি।'

'এ নিয়ে কিছু কাজ আমিও করেছি তা জান বোধ হয়।'

'জানি। আমি তোমার কিছু লেখাও পড়েছি।'

'আমি শেষ লেখা লিখেছি দশ বছর আগে। আমার আসল গবেষণা শুরু হয়েছে সেই লেখার পর। এই গবেষণার বিষয় একটি তথ্যও আমি কোথাও প্রকাশ করিনি।'

আমি চুপ করে রইলাম। বোর্গেল্টও চুপ করে একদৃষ্টে তাঁর কোটরাগত নীল চোখ দিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। কোথায় যেন একটা দুম দুম করে শব্দ হচ্ছে। বাড়িরই মধ্যে, কিন্তু কাছাকাছি নয়। পমার এত দেরি করছেন কেন? উনি কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছেন?

বোর্গেল্ট বললেন, 'পমারের ফোনটা বোধ হয় জরুরি।'

আমি চমকে উঠলাম। আমি তো কিছু বলিনি ওঁকে। উনি আমার মনের কথা বুঝলেন কী করে?

এবার বোর্গেল্ট একটা প্রশ্ন করে বসলেন যেটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

'তোমার রোবোটা আমাকে বিক্রি করবে?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কী কথা। কেন বলো তো?'

বোর্গেল্ট গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমার ওটা দরকার। কারণ শুধু একটাই। আমার রোবো অঙ্ক কষতে জানে না, অথচ ওটার আমার বিশেষ প্রয়োজন।'

'তোমার রোবো কি এখানে আছে?'

বোর্গেল্ট মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

থেকে থেকে গুম গুম গুম গুম শব্দ, আর পমারের ফিরতে দেরি—এই দুটো ব্যাপারেই কেমন যেন অসোয়াস্তি লাগছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বোর্গেল্টের রোবো এই বাড়িতেই আছে জেনে, আর তাকে হয়তো দেখতে পাব এই মনে করে, একটা উত্তেজনার শিহরন অনুভব করলাম।

বোর্গেল্ট বললেন, 'আমার রোবোর মতো রোবো আজ পর্যন্ত কেউ তৈরি করতে পারেনি। আমি—গটফ্রীড বোর্গেল্ট—যা সৃষ্টি করেছি তার কোনও তুলনা নেই। কিন্তু

আমার রোবোর একটি গুণের অভাব। সে তোমারটার মতো অত সহজে অঙ্ক কষতে পারে না। অথচ তার এই অভাব পূরণ করা দরকার। তোমার রোবোটা পেলে সে কাজটা সম্ভব হবে।'

আমার ভারী বিরক্ত লাগল। এমন জিনিস কি কেউ কখনও পয়সার জন্য হাতছাড়া করে? আমার এত সাধের নিজের হাতের তৈরি প্রথম রোবো—এটা আমি হাইডেলবার্গের আধপাগলা বৈজ্ঞানিককে বিক্রি করে দেব? কীসের জন্য? আমার এমন কী টাকার দরকার পড়েছে। আর ওই অঙ্কের ব্যাপারটাতেই তো আমার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। বোর্গেল্ট যেমন রোবোই তৈরি করে থাকুন না কেন, উনি নিজে যাই বলুন, আমি জানি আমার চেয়ে আশ্চর্য কোনও যান্ত্রিক মানুষ তিনি কখনওই তৈরি করেননি।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'মাপ করো, বোর্গেল্ট। ও জিনিসটা আমি বেচতে পারব না। সত্যি বলতে কী, তুমি যখন এত বড় বৈজ্ঞানিক—তখন আরেকটু পরিশ্রম করলে আমি যে জিনিসটা করেছি সেটা তুমি করতে পারবে না কেন?'

'তার কারণ—' বোর্গেল্ট সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন—'সবাই সব জিনিস পারে না। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। চেষ্টা করলে যে পারি তা আমিও জানি, কারণ আমার অসাধ্য কিছু নেই। কিন্তু সময় কম। আমার টাকা পয়সাও যা ছিল সবই গেছে। আমার বাড়ি দেনার দায়ে বাঁধা পড়ে আছে। সব কিছু গেছে আমার ওই একটি রোবো তৈরি করতে। কোটি কোটি মার্ক খরচ করেছি আমি ওটার পিছনে। কিন্তু ওই একটা গুণের অভাবে ওটা নিখুঁত হয়নি। ওটা আমার চাই। ওটা পেলে আমি আমার রোবো থেকেই আমার সমস্ত টাকা আবার ফিরে পাব। লোকে বলবে, হ্যাঁ—বোর্গেল্ট যা করেছে তার বেশি কিছু করা মানুষের সাধ্য নয়। আমার সিন্দুকে কিছু সোনার গেল্ড রাখা আছে—চারশো বছরের পুরনো। সে গেল্ড আমি তোমাকে দেব ; তুমি রোবোটা বিক্রি করে দাও।'

সোনার লোভ দেখাচ্ছেন আমাকে! লোভ জিনিসটা যে কতকাল আগে জয় করেছি তা তো আর বোর্গেল্ট জানেন না! এবার আমিও আমার গলার স্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললাম, 'তোমার কথাবার্তার সুর আমার ভাল লাগছে না, বোর্গেল্ট। সোনা কেন—হিরের খনি দিলেও আমার রোবুকে বিক্রি করব না।'

'তা হলে আর তুমি কোনও রাস্তা রাখলে না আমার জন্য।'

এই বলে বোর্গেল্ট প্রথমেই যে কাজটা করলেন সেটা হল সোজা গিয়ে সিঁড়ির দিকের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া। তারপর উলটো দিকে যে দরজাটা ছিল—বোধ হয় খাবার ঘরে যাবার—সেটাও তিনি বন্ধ করে দিলেন। কাচের জানলাগুলো এমনিতেই বন্ধ। খোলা রইল শুধু লাইব্রেরির দরজা। রোবু রয়েছে ওই লাইব্রেরিঘরে, আর এই প্রথম আমার মনে হল যে, আমি হয়তো আর রোবুকে দেখতে পাব না। হয়তো সে আর কয়েকদিনের মধ্যেই অন্য মালিকের হয়ে কাজ করবে, তার হয়ে কঠিন কঠিন অঙ্কের সমাধান করবে। আর পমার? আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, পমারের সঙ্গে বোর্গেল্ট ষড় করে আমার সর্বনাশ করতে চলেছে।

দুম দুম দুম দুম—আবার সেই শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হয় মাটির নীচ থেকে আসছে সে শব্দটা। কীসের শব্দ? বোর্গেল্টের রোবো?

আর ভাববার সময় নেই। বোর্গেল্ট আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আবার সেই নিষ্পলক দৃষ্টি। এমন নিষ্ঠুর চাহনি আমি আর কারও চোখে দেখিনি।

এবার যখন বোর্গেল্ট কথা বললেন তখন দেখলাম তাঁর গলায় আর সে মোলায়েম ভাবটা নেই। তার বদলে একটা আশ্চর্য ইস্পাতসুলভ কাঠিন্য।

'প্রাণ সৃষ্টি করার চেয়ে প্রাণ ধ্বংস করা কত বেশি সহজ সেটা তুমি জান না শঙ্কু ?' গলার স্বর বন্ধ ঘরে গম গম করে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। 'একটি মাত্র ইলেকট্রিক শক্। কত ভোল্টের জান ? তোমার রোবু জানতে পারে।...আর সে শক্ দেওয়ার পন্থাটিও ভারী সহজ...'

আমার গায়ে সেই শক্-রোধ করা কার্বোথিনের গেঞ্জিটা পরা আছে। শকে আমার কিচ্ছু হবে না। কিন্তু গায়ের জোরে এই জার্মানের সঙ্গে পারব কী করে ?

আমি চিৎকার করে উঠলাম—'পমার ! পমার !'

বোর্গেল্ট তাঁর ডান হাতটাকে সামনে বাড়িয়ে পাঁচটা আঙুল সামনের দিকে সোজা করে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর চোখে হিংস্র উল্লাসের দৃষ্টি।

আমি পেছোতে গিয়ে সোফায় বাধা পেলাম। পেছোনোর কোনও উপায় নেই।

বোর্গেল্টের হাতের আঙুল আমার কপাল থেকে ছ' ইঞ্চি দূরে। গিরিডির কথা—

ঠং ঠং ঠং ঠং—

একটা শব্দ শুনে আমার দৃষ্টি ডান দিকে ফিরল। বোর্গেল্টও যেন চমকে গিয়ে ঘাড় ফেরালেন। তারপর এক আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটল। ল্যাবরেটরির দরজা দিয়ে আমাদের ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হল আমারই হাতের তৈরি যান্ত্রিক রোবু। তার চোখ এখনও ট্যারা, তার মুখে এখনও আমারই দেওয়া হাসি।

চোখের নিমেষে একটা ইস্পাতের ঝড়ের মতো এগিয়ে এসে তার হাতদুটোকে বাড়িয়ে দিয়ে সে জাপটে ধরল বোর্গেল্টকে।

আর তারপর যেটা ঘটল সেরকম বিচিত্র বীভৎস জিনিস আমি আর কখনও দেখিনি।

রোবুর হাতের চাপে বোর্গেল্টের মাথাটা যেন প্যাঁচের মতো একেবারে পিঠের দিকে ঘুরে গেল। তারপর রোবুরই টানে সেই মাথাটা শরীর থেকে একেবারে আলগা হয়ে গিয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল, আর শরীরের ভিতর থেকে গলার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল একরাশ বৈদ্যুতিক তার !

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে প্রায় অবশ অচেতন অবস্থায় ধপ করে সোফায় বসে পড়লাম। চোখ, মন, মস্তিষ্ক সব যেন ধাঁধিয়ে গিয়েছিল।

প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় বুঝতে পারলাম সিঁড়ির দিকের দরজায় ধাক্কা পড়ছে।

'শঙ্কু, দরজা খোলো—দরজা খোলো !'

পমারের গলা।

হঠাৎ যেন আমার শক্তি আর জ্ঞান ফিরে পেলাম। সোফা ছেড়ে উঠে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখি তিনজন লোক—পমার, বোর্গেল্টের বুড়ো চাকর রুডি, আর—হ্যাঁ, কোনও সন্দেহ নেই—ইনি হলেন আসল বৈজ্ঞানিক গটফ্রীড বোর্গেল্ট।

এর পরের ঘটনা আর বেশি নেই। আমার মনের কয়েকটা প্রশ্নের মধ্যে একটা পমারের কথায় মুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

'সেদিন মাঝরাত্তিরে আমি ল্যাবরেটরিতে ঢুকে তোমার রোবুর মাথার ভিতর আমারই আবিষ্কৃত একটা যন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। তার ফলে তোমার সঙ্গে ওর মনের একটা টেলিপ্যাথিক যোগ হয়ে গিয়েছিল। তোমার বিপদ বুঝে তাই আর ও চুপ করে থাকতে পারেনি।'

বোর্গেল্ট বললেন, 'এসব যান্ত্রিক মানুষ যন্ত্রের মতো হওয়াই ভাল। আমার রোবোকে আমি এত বেশি আমার মতো করে ফেলেছিলাম বলেই ও আমাকে সহ্য করতে পারল না।

ঠিক ওরই মতো আরেকজন কেউ থাকে সেটা ও চাইল না। ভেবেছিলাম, আমার মৃত্যুর পর ও আমার কাজ চালিয়ে যাবে, কিন্তু ব্রেন জিনিসটার মতিগতি কি আর মানুষ স্থির করতে পারে ? যেই ওর বাঁধন খুলে দিলাম, অমনি ও আমাকে বন্দি করে ফেলল। আমাকে মারেনি, তার কারণ ও জানত যে বিগড়ে গেলে আমি ছাড়া ওর গতি নেই।'

পমার বললেন, 'রুডি সবই জানত—কিন্তু ভয়ে কিছু করতে পারছিল না। আজকে ফোনের ধাপ্পাটা রুডিরই কারসাজি। ও চেয়েছিল আমাকে বাইরে এনে বোর্গেল্টের বন্দি হওয়ার কথাটা বলে, আর তারপর দুজনে মিলে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে। সেই ফাঁকে যে তোমার জীবন এইভাবে বিপন্ন হবে তা আমি ভাবতে পারিনি।'

একটা জিনিস হঠাৎ বুঝতে পেরে আমার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। বললাম, 'রোবু

BanglaBook.blogspot.com

সেদিন বোর্গেল্টের নাম কেন বলেনি বুঝতে পারছেন তো ? যে আসলে বোর্গেল্ট নয়, তার নাম বোর্গেল্ট ও কী করে বলবে ? আমরা বুঝিনি, কিন্তু ও ঠিক বুঝেছিল। যন্ত্রই যন্ত্রকে চেনে ভাল !'

সন্দেশ। মাঘ, ফাল্গুন ১৩৭৪

প্রোফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস্য রহস্য

pathagar.boi.blogspot.com

১৩ই জানুয়ারি

গত ক'দিনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি, তাই আর ডায়রি লিখিনি। আজ একটা স্মরণীয় দিন, কারণ আজ আমার লিঙ্গুয়াগ্রাফ যন্ত্রটা তৈরি করা শেষ হয়েছে। এ যন্ত্রে যে কোনও ভাষার কণ্ঠস্বর রেকর্ড হয়ে গিয়ে তিন মিনিটের মধ্যে তার বাংলা অনুবাদ ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে। জানোয়ারের ভাষার কোনও মানে আছে কি না সেটা জানার একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। আজ আমার বেড়াল নিউটনের তিন রকম ম্যাও রেকর্ড করে তার তিন রকম মানে পেলাম। একটা বলছে 'দুধ চাই', একটায় 'মাছ চাই' আর একটায় 'ইঁদুর চাই'। বেড়ালরা কি তা হলে খিদে না পেলে ডাকে না ? আরও দু রকম ম্যাও রেকর্ড না করে সেটা বোঝবার কোনও উপায় নেই।

মাছ বলতে মনে পড়ল—আজ খবরের কাগজে (মাত্র একটা বাংলা কাগজে) একটা খবর বেরিয়েছে, সেটার সত্যি মিথ্যে জানি না, কিন্তু সেটা যদি বানানোও হয়, তা হলে যে বানিয়েছে তার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হয়। খবরটা এখানে তুলে দিচ্ছি—

> 'গোপালপুর, ১০ জানুয়ারি। গোপালপুরের সমুদ্রতটে একটি আশ্চর্য ঘটনা স্থানীয় সংবাদদাতার একটি আশ্চর্য বিবরণে প্রকাশ পাইয়াছে। উক্ত বিবরণে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য সকালে নুলিয়া শ্রেণীর কতিপয় ধীবর জাল ফেলিয়া সমুদ্র হইতে মাছ ধরিয়া সেই জাল ডাঙায় ফেলিবামাত্র উহা হইতে বিশ পঁচিশটি রক্তাভ মৎস লাফাইতে লাফাইতে পুনরায় সমুদ্রের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জলমধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। নুলিয়াদের কেহই নাকি এই মৎস্যের জাত নির্ণয় করিতে পারে নাই, এবং জালবদ্ধ মৎস্যের এ হেন ব্যবহার নাকি তাহাদের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।'

আমার প্রতিবেশী অবিনাশবাবু খবরটা পড়ে বললেন, 'এ তো সবে শুরু। এবার দেখবেন জল থেকে মাছ ড্যাঙায় ছিপ ফেলে মানুষ ধরে ধরে ফ্রাই করে খাচ্ছে। জলচর স্থলচর আর ব্যোমচর—এই তিন শ্রেণীর জীবের উপরেই মানুষ যে অত্যাচার এতদিন চালিয়ে এসেছে। একদিন না একদিন যে তার ফলভোগ করতে হবে তাতে আর আশ্চর্য কী ? আমি তো মশাই অনেকদিন থেকেই নিরামিষ ধরার কথা ভাবছি।'

এই শেষের কথাটা অবিশ্যি ডাহা মিথ্যে, কারণ, আর কিছু না হোক—অন্তত ইলিশমাছ